জাতিসংঘ মহাসচিবের নয়া প্রযুক্তিবিষয়ক কৌশল

গোলাপ মুনীর

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস প্রকাশ করেন তার 'স্ট্র্যাটেজি অন নিউ টেকনোলজিস'। এটি এরই মধ্যে পরিচিতি লাভ করেছে 'ইউএন সেক্রেটারি জেনারেল'স স্ট্র্যাটেজি অন নিউ টেকনোলজিস' নামে। আমাদের ভাষায় যা 'জাতিসঙ্ঘের মহাসচিবের নয়া প্রযুক্তিবিষয়ক কৌশল'।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জৈবপ্রযুক্তি, বস্তুবিজ্ঞান ও রোবোটিকসের মতো দ্রুত বিকাশমান প্রযুক্তিসহ নতুন নতুন প্রযুক্তি মানব কল্যাণকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য ধরনের প্রতিশ্রুতিশীল। একই সাথে এগুলো সৃষ্টি করে অধিকতর বৈষম্য ও সন্ত্রাস। সে কারণে আমাদের প্রয়োজন বর্তমান ও নতুন অংশীদারদের সাথে নিয়ে একযোগে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা, যাতে আমরা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জগুলো সফলভাবে মোকাবেলা করতে পারি। সেই সাথে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিরোধগুলো– বিশেষত ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, মানবাধিকার, নৈতিকতা, সমতা ও ন্যাপরায়ণতা, সার্বভৌমত্ব, দায়দায়িত্ব, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ইত্যাদি ক্ষেত্রের বিরোধগুলো দূর করতে পারি।

জাতিসঙ্ঘের অভ্যন্তরীণ এই কৌশলের লক্ষ্য হচ্ছে : এই কৌশলপত্রের মাধ্যমে পুরো জাতিসংঘ-ব্যবস্থায় নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার ত্বরান্বিত করায় সহায়তা করা। সে লক্ষ্যে এই কৌশলপত্রে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো (এসডিজি), জাতিসংঘ সনদ ও সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার লক্ষ্যসমূহ অর্জন এবং আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতির উন্নয়ন সাধনে এটিকে একটি গাইড হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

পাঁচ নীতি

জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব এ তাগিদ থেকেই নতুন প্রযুক্তি প্রশ্নে জাতিসঙ্ঘের সংশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রে ৫টি নীতি বা প্রিন্সিপল চিহ্নিত করেছেন– ০১. বৈশ্বিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন : জাতিসঙ্ঘের কর্মকাণ্ড হবে মূল্যবোধ এবং জাতিসংঘ সনদ ও সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের দায়বোধভিত্তিক; ০২. অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতা : জাতিসংঘকে কাজ করতে হবে সরকার, ব্যবসায় ও সুশীল সমাজের সব প্রজন্মের জন্য প্ল্যাটফরম জোগানোর ব্যাপারে, যাতে সবাই যৌথভাবে প্রযুক্তিবিষয়ক সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারে; ০৩. অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ : সবার জন্য সম্মিলিত জ্ঞান, পরীক্ষা ধারণা ও সংলাপ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘকে নজর দিতে হবে অংশীদারিত্বের ওপর; ০৪. বিদ্যমান সক্ষমতা ও ম্যান্ডেটের ওপর নির্মাণ : নতুন কোনো প্রযুক্তিতে জাতিসঙ্ঘের সংশ্লিষ্টতার সময় অপরিহার্য কাজ হচ্ছে জাতিসংঘ সনদের মূল্যবোধ রক্ষা ও আজ পর্যন্ত বিদ্যমান জাতিসংঘ ম্যান্ডেট বাস্তবায়ন– এটি নতুন কোনো ম্যান্ডেট নয়; এবং ০৫. বিনয়ী হওয়া এবং অব্যাহত শিক্ষা গ্রহণ : অনেক শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুশীল সমাজগোষ্ঠী, সরকারি কমিটি ও জাতিসংঘ এসব ক্ষেত্রে সহজে অংশীদার হয় না– তাই জাতিসঙ্ঘের উচিত সবার কাছ থেকে এসব নীতির ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা গ্রহণ করা।

পাঁচ কৌশলগত প্রতিশ্রুতি

নয়া প্রযুক্তিবিষয়ক কৌশলপত্রে জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব ঘোষণা করেছেন চারটি কৌশলগত প্রতিশ্রুতি তথা স্ট্র্যাটেজিক কমিটমেন্ট। তিনি এই প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করতে গিয়ে কৌশলপত্রে উল্লেখ করেন– 'নয়া প্রযুক্তি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হওয়ার প্রয়োজনে আমি জাতিসঙ্ঘের সক্ষমতা বাড়াবো : স্টাফদের প্রশিক্ষণ দিয়ে, আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে, এবং প্রধান প্রধান প্রযুক্তির অগ্রগতি সম্পর্কে হালনাগাদ থেকে– যাতে জাতিসঙ্ঘের স্টাফ আমাদের ম্যান্ডেটের সাথে সঙ্গতি রেখে এসব উন্নয়ন সম্পর্কে অংশীজনদের ঝুঁকি ও উপকার বিষয়ে তাদের সাথে আরো বেশি সংশ্লিষ্ট হতে পারে। আমি বিভিন্ন ধরনের অংশীদারদের সাথে নতুন নতুন প্রযুক্তির ঝুঁকি ও উপকার নিয়ে কথা বলে তাদের সাথে আমাদের সংশ্লিষ্টতা আরো বাড়িয়ে তুলব।'

আমি 'ডিজিটাল কো-অপারেশন'-সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের প্যানেলের সাথে আলোচনা করে একজন 'প্রযুক্তি দূত' নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারি। আমরা আরো সংলাপ চালাব নরমেটিভ ও কো-অপারেটিভ ফ্রেমওয়ার্কের বিষয়ে : বিদ্যমান চুক্তি ও সুপারিশমালাসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা করে এবং প্রতিষ্ঠিত মাল্টি-স্টেকহোল্ডার মেকানিজম জোরদার করে তুলে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সরকারি, বেসরকারি ও বেসামরিক পক্ষের নেতাদের সমন্বয়ে আমি প্রতিষ্ঠা করব একটি উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল। এই প্যানেল নতুন ধরনের সহযোগিতা প্রশ্নে আমাকে উপদেশ দেবে।

আমরা সদস্য দেশগুলোর প্রতি সহায়তা বাড়িয়ে দেব : জাতীয় ও আঞ্চলিক সক্ষমতা বাড়িয়ে তুলে; জ্ঞান ও নীতিসংলাপে অর্থপূর্ণ প্রবেশ নিশ্চিত করে; এবং সরকারগুলোর ধারণার সাথে অংশীদারদের সংযুক্ত করে সমাধানে টানার মাধ্যমে। এসব প্রতিশ্রুতি হচ্ছে এই সংগঠনের প্রশস্ততর রূপান্তরের অংশ। শেখার ও সংশ্লিষ্ট হওয়ার কাজটি অব্যাহত রেখে আমরা ওপরে তুলে আনব আমাদের প্রত্যাশার মাত্রা– সবার কল্যাণে প্রযুক্তি ডিজাইন, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের ব্যাপারে।

এ কৌশলই শেষ কথা নয়

এই কৌশল জাতিসংঘ সনদ, সার্বজনীন মানবাধিকার ও ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে জাতিসঙ্ঘের প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতাকে জোরদার করবে। কিন্তু এই কৌশলই শেষ কৌশল নয়। এটি ডিজাইন করা হয়েছে এই সংঠনের প্রশস্ততর সংস্কারে অবদান রাখার বিষয়টি মাথায় রেখে, যাতে একুশ শতাব্দীতে এটি আমাদের সনদের প্রতিশ্রুতি পালনে অবদান রাখতে পারে। জাতিসঙ্ঘের উন্নয়ন ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য প্রয়োজন এর ডাটা সাক্ষরতা, প্রযুক্তি, সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সক্ষমতা বাড়ানো এবং ব্যস্থাপনা সংস্কারের জন্য প্রয়োজন সেক্রেটারিয়েটের ভেতরে ও এর সদস্য দেশগুলোতে স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য প্রাযুক্তিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার। অতএব এই কৌশলপত্র পাঠ করতে হবে এই সংগঠনের প্রাযুক্তিক সজ্জিতকরণ জোরদার করা, প্রাপ্ত নীতিফল নিয়ে কাজ করা, এবং ওরিয়েন্টেশনাল ও ম্যানেজমেন্ট চ্যালেঞ্জ গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি 'ক্রস-কাটিং' পদক্ষেপ হিসেবে। কৌশলপত্রে জাতিসংঘ মহাসচিব বলেছেন, তিনি এই উভয় ক্ষেত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বিনয়ী হবেন। আর জাতিসংঘকে নিশ্চিত করতে হবে– এই স্ট্র্যাটেজি ডিজাইন করা হয়েছে সবার কল্যাণের জন্য, যারা নতুন প্রযুক্তির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সুযোগ দেয়ার জন্য এবং সেই সাথে জটিল নীতিসিদ্ধান্ত নেয়ায় সদস্য দেশগুলোর সক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার জন্য। তবে জাতিসংঘ অবশ্যই সকল পক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তাদের দায়দায়িত্ব ও আমাদের সবার সম্মিলিত বোধ সম্পর্কে। একই সাথে অংশীদার হিসেবে আমাদের অর্জন করতে হবে ও বজায় রাখতে হবে বিশ্বসযোগ্যতা, যা বিশ্বব্যাপী অংশীজনদের সহায়তা দেবে নতুন প্রযুক্তির ফলাফল ও পরিণাম কার্যকরভাবে চিহ্নিত করায় এবং উন্নয়ন ঘটাবে তাদের দায়িত্বশীল ব্যবহারের। অতএব এই কৌশলে একটি 'ইন-ওয়ার্ড-লুকিং ডাইমেনশন' তথা 'অন্তর্মুখী মাত্রা' রয়েছে। নতুন প্রযুক্তির সম্ভাবনাময় প্রয়োগ সম্পর্কিত জাতিসঙ্ঘের জ্ঞান অব্যাহতভাবে হালনাগাদ করতে হবে ও তাতে শান দিতে হবে। ওপর থেকে শুরু করে– সদর দফতর থেকে দেশ পর্যায় পর্যন্ত– আমাদের সবাইকে প্রযুক্তির অগ্রদূত, উদ্ভাবক, নীতিনির্ধারক ও ব্যবহারকারীদের সাথে সহযোগী হিসেবে কাজ করতে হবে। প্রত্যেক স্টাফকে অবশ্যই বুঝতে হবে, কী করে নতুন প্রযুক্তি তাদের কাজের ওপর প্রভাব ফেলছে। তাদেরকে উদঘাটন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে, সংশ্লিষ্ট ম্যান্ডেটের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি আরো বেশি সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

চাপিয়ে দেয়া কৌশল

জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব এই কৌশল রচনা করেছেন বড় বড় প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাব্য কিছু ঝুঁকির ওপর আলোকপাত করে। এই নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি ও ঝুঁকি উভয়ই অনুমিত ও অনিচ্ছাকৃত। তিনি পাখির চোখে দূর থেকে পর্যালোচনা চালিয়েছেন, নতুন নতুন প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট হওয়ার বিষয়ে তিনি কী করে পরিচালনা করবেন তার সেক্রেটারিয়েট, এবং সেই সাথে পরিচালনা করবেন জাতিসঙ্ঘের সংস্থা, তহবিল ও কর্মসূচিগুলো। মহাসচিব উল্লেখ করেছেন, পাঁচটি নির্দেশনা-নীতি এবং এগুলোর সাথে আছে চারটি কৌশলগত প্রতিশ্রুতি। এই কৌশলপত্রে একটি বাস্তব ক্ষেত্রেও গভীর অনুসন্ধান চালানো হয়নি (যেমন : শান্তিরক্ষী অথবা উদ্ভাবনীমূলক উন্নয়ন অর্থায়নের ক্ষেত্র), যেখানে সুনির্দিষ্ট কৌশল এরই মধ্যে কার্যকর রয়েছে।

আলোচ্য কৌশলের নতুন পদক্ষেপের কাজে নতুন প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা ও এ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘকে ভালো অবস্থানে নিয়ে দাঁড় করবে। এর আরোপিত ইতিবাচক দিকগুলোর অন্যতম একটি হচ্ছে– সম্মিলিত কর্মকাণ্ড। এর সার্বিক সাঙ্কেতিক প্রতীকী বার্তাকে অস্বীকার করা যাবে না; এটি নয়া প্রযুক্তিসম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে বহুপাক্ষিকতাবাদ তথা মাল্টিলেটারেলিজমের সুস্পষ্ট উপস্থাপন। এর বক্তব্য হচ্ছে– সম্মিলিত কর্মকাণ্ড শুধু নয়া প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্যই অপরিহার্য নয়, বরং অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই শান্তি অর্জনেও এটি অপরিহার্য। এই ইতিবাচকতা জোরালোভাবে কথা বলে ২০১৬ সালের 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন অন মাল্টিলেটারেলিজম'-এর সুপারিশমালার পক্ষে, যা নয়া প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে সম্মিলিত কর্মকাণ্ডকে প্রয়োজনীয় বলে চিহ্নিত করেছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, নিচ থেকে উপরমুখী পদক্ষেপে লার্নিং ও পার্টনারশিপের ওপর জোর তাগিদ দেয়া। জাতিসঙ্ঘের অন্যান্য সমস্যা থেকে ব্যতিক্রমী হয়ে– যেখানে সরকারগুলো কাজ করে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে, সেখানে এই স্ট্র্যাটেজি সুস্পষ্ট করে তোলে জাতিসংঘ ব্যবস্থা একটি নেতৃস্থানীয় ব্যবস্থা হওয়ার বাইরে অবশ্যই লার্নিংয়ের কাজটি অব্যাহত রাখতে হবে বেসামরিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে। বেসরকারি কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ রয়েছে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ (আর অ্যান্ড ডি) পরিচালনার জন্য। কিন্তু 'আর অ্যান্ড ডি' ও উদ্ভাবনের কাজের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিবর্গ, সমাজ ও প্রতিষ্ঠান সরাসরি কিছু সুনির্দিষ্ট সমস্যার মুখোমুখি হন। জাতিসংঘভুক্ত দেশ, টিম ও জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বের মধ্যকার প্রস্তাবিত নিয়মিত আন্তঃক্রিয়া ডিজাইন করা হয়েছে নতুন নতুন প্রকল্পে অংশ নেয়া ও স্থানীয় সমাধানের জন্য এ ধরনের আন্তঃক্রিয়া ও নিচ থেকে ওপরমুখী পদক্ষেপ সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে।

তৃতীয় ইতিবাচক পদক্ষেপটি হচ্ছে, জাতিসঙ্ঘের কাজে নয়া প্রযুক্তি সংযুক্তির ক্ষেত্রে অন্তর্মুখী আলোকপাত। এই স্ট্র্যাটেজি থেকে আরেকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়– জাতিসঙ্ঘের কিছু সংস্থা ও বিভাগ এরই মধ্যে ব্যবহার করছে মেশিন লার্নিং, রোবোটিকস ও কমপিউটেশনাল সায়েন্স। তাই বলা যায়, এই সিস্টেমের কিছু কিছু অংশে এখনই কাজ করছে একুশ শতাব্দীর প্রতিষ্ঠান হিসেবে একুশ শতাব্দীর সমস্যা সমাধানে। জাতিসঙ্ঘের পরিচালনাগত ও বিশ্লেষণী বিষয়ে আরো বেশি মাত্রায় নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যাপক প্রচলন এর দক্ষতা ও ম্যান্ডেট সরবরাহের উন্নয়ন ঘটাবে।

চতুর্থ বিষয়টি হচ্ছে, কী করে নয়া প্রযুক্তি প্রয়োগ করা যাবে গুরুত্বপূর্ণ মানব-নিরাপত্তা সমস্যা সমাধানে। এই কৌশলপত্রে যেসব শিল্প ও প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, মহাসচিব তার মধ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান ও খাদ্য নিরাপত্তার ওপর আলোকপাত করে। এসব ক্ষেত্র জাতিসঙ্ঘের মূল উন্নয়ন ও মানবিক উন্নয়নের আওতাভুক্ত। জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন সংস্থা কাজ করছে এসব ক্ষেত্রে। এর মধ্যে মানব-নিরাপত্তা সমস্যাটি সমন্বিত বিশ্লেষণ সমীক্ষার জন্য পরিপক্ব অবস্থায় আছে। বাস্তবতা হচ্ছে, নয়া প্রযুক্তির একটা বাধার প্রভাব ও অচিহ্নিত প্রভাব থাকবে শ্রমবাজার ও খাদ্য-নিরাপত্তার ওপর। এর বিপরীতে বহু-অংশীজনদের নিয়ে সংঘবদ্ধ প্রয়াস চালানোর জন্য জাতিসঙ্ঘের প্রস্তুতি একটি সঠিক পদক্ষেপ।

সবশেষ ইতিবাচক দিকটি হচ্ছে, এই কৌশলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে– আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য নয়া প্রযুক্তি ও এর ঝুঁকির

মধ্যকার একটি নেক্সাস বা বন্ধন রয়েছে। নয়া প্রযুক্তি ক্রমবর্ধমান হারে পরিবর্তন করে চলেছে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ও গতি। সাইবারযুদ্ধ, মানুষবিহীন ড্রোন ও কমবেট রোবট হচ্ছে প্রযুক্তির অগ্রগতির মাত্র তিনটি উদাহরণ। এগুলো আগামী দশকগুলোর যুদ্ধের আকার-প্রকার পাল্টে দেবে। নয়া প্রযুক্তির বাইরে রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় ক্রীড়নকেরা প্রযুক্তি অগ্রগতি ঘটিয়ে চলেছে সন্ত্রাসী দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের লক্ষ্য পূরণের কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য। জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব কুণ্ঠাবোধ করেননি একথা স্বীকার করতে– নিরাপত্তা পরিষদ দ্রুত এসব বিষয় বিবেচনায় নেয় না। এভাবে এই কৌশলে এ ব্যাপারে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের কথা উল্লেখ রয়েছে।

জবাবহীন প্রশ্নগুলো

আলোচ্য কৌশলপত্রে জাতিসংঘ-ব্যবস্থা কী করে নয়া প্রযুক্তি বিষয়ে পদক্ষেপ নেবে এবং প্রযুক্তির সাথে জাতিসঙ্ঘের কর্মকাণ্ড সম্পৃক্ত করবে, সেসব বিষয়ে কিছু বাস্তব অগ্রসর ধরনের প্রয়াসের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই কৌশলপত্রে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা সমস্যা। কী করে এসব সমস্যার সমাধান হবে, কৌশলপত্রে এর উল্লেখ নেই। এবং এসব বিষয় শেষ পর্যন্ত এই কৌশলের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে।

নীতি, মূল্যবোধ, দায় ও দায়িত্বের সমন্বয় সাধন : মহাসচিব যথার্থ কারণেই স্বীকার করেছেন, 'বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি মাত্র উপায় হচ্ছে– নীতি, মূল্যবোধ, দায় ও দায়িতের সমন্বয় সাধন। এর আলোকেই চলতে হবে প্রযুক্তির ডিজাইন, উন্নয়ন ও ব্যবহার।' তা সত্ত্বেও এটি উপস্থাপন করে জাতিসংঘ-ব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে বড় ধরনের দুঃসাধ্য দ্বান্দ্বিক কাজ। ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি সম্পর্কিত মুখ্য সমস্যা সমাধানে কোনো সুস্পষ্ট সার্বজনীন নিয়মতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেই। উদাহরণত, ইন্টারনেটের সর্বব্যাপিতা নানা প্রশ্নের জন্ম দেয় : কে তথ্যের মালিক, আর কাদের অধিকার রয়েছে তথ্যে প্রবেশের? ব্যক্তিসাধারণের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা তথা প্রাইভেসি রক্ষার অধিকার কতটুকু? ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সংঘবদ্ধ নিরাপত্তা-সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর সমাধান কোন পথে? একইভাবে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে নয়া প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন আছে। প্রশ্ন আছে মানবাধিকার বিষয়ে এর প্রয়োগসিদ্ধতা ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো নিয়ে। এসব সমস্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ, সমাজ ও অঞ্চল বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ নেয়। অতএব এ ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছা কঠিন। জাতিসঙ্ঘের উচ্চপর্যায়ের ডিজিটাল সহযোগিতাবিষয়ক প্যানেল এই সংক্রান্ত মূল্যবান সুপারিশমালা তুলে ধরতে পারে। এর ওপর ভিত্তি করে মহাসচিব সদস্য দেশগুলোর সাথে একটি মতৈক্য গড়ে তুলতে পারবেন।

ডিজিটাল ডিভাইডের অবসান ঘটানো : স্মিয়করভাবে এই কৌশলপত্রে ডিজিটাল ডিভাইড সম্পর্কে কমই নজর দেয়া হয়েছে। ডিজিটাল ডিভাইড হচ্ছে সমাজে ইন্টারনেট ও প্রযুক্তিসেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান বৈষম্য। সাম্প্রতিক গবেষণা মতে– ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে ডিজিটাল ডিভাইড ক্রমেই বাড়ছে। একইভাবে অধিকতর গরিব দেশগুলোতে ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ অনেক বেশি। অথচ ইন্টারনেট হচ্ছে প্রাযুক্তিক অগ্রগতি পরিমাপের অন্যতম কষ্টিপাথর। সমসাময়িক সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইন্টারনেট এখন সর্বব্যাপী। ইন্টারনেট কার্যত সব আধুনিক প্রযুক্তির ভিত্তি। ২০১৭ সালে 'হিউম্যান রাইট কাউন্সিল' একটি 'নন-বাইন্ডিং রেজ্যুলেশন' পাস করে। এতে বলা হয়– ব্যক্তির মতপ্রকাশের সব অধিকার প্রয়োগ হবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে মতপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। এতে উল্লেখ করা হয়, আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষা উন্নয়নে এর ভূমিকার কথা। আগামী বছরগুলোতে জাতিসংঘ ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে পড়তে পারে ইন্টারনেট সম্পর্কিত এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি নিয়ে। তাই এটি মহাসচিবের কৌশলপত্রে এটি হওয়া উচিত ছিল কেন্দ্রীয় এক বিষয়।

জাতিসংঘ সংস্কার প্রক্রিয়ার সাথে সমন্বয়ন : মহাসচিবের এই নতুন কৌশলে স্পষ্ট করা হয়নি 'অফিস অব ইনফরমেশন টেকনোলজি' (ওআইসিটি)-সহ বর্তমানের চলমান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সংস্কার ও স্থগিত করে রাখা মানবসম্পদ সংস্কার প্রক্রিয়ার সাথে এই কৌশল কী মাত্রায় সমন্বিত করা হবে। এককভাবে ওআইসিটির প্রত্যাশা ছিল সেক্রেটারিয়েটের সব আইসিটি কর্মকাণ্ড আরো সুসংহত করা হবে, যাতে সেক্রেটারিয়েটের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বিজনেস মডেলে নমনীয়তা, সুবিধাদি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় এবং উত্তরণ ঘটানো যায় ওয়ান-সাইজ-ফিটস-অল-অ্যাপ্রোস-এ। একটি 'নিউ টেকনোলজি রেফারেন্স গ্রুপ' সৃষ্টির মাধ্যমে এই স্ট্র্যাটেজির পর্যালোচনা ও দেখা-শোনার কাজটি করবে ইওএসজি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ও মনিটরিং ইউনিট। এটি অস্পষ্ট– এই কৌশলের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করবে ওআইসিটি অথবা কী করে এটি কৌশলগত প্রতিশ্রুতি পালনে সহায়তা করবে।

একইভাবে সেক্রেটারিয়েটের মানবসম্পদ ব্যবস্থা সম্পর্কিত সংস্কারের বিষয়টি জাতিসঙ্ঘের ৭৩তম সাধারণ পরিষেদের আলোচনায় আসার প্রত্যাশা ছিল। এবং সেই সাথে প্রত্যাশা ছিল বিষয়টি অর্থপূর্ণভাবে বিবেচনায় আসবে আলোচ্য কৌশলে। জাতিসংঘ ব্যবস্থার জন্য এবং বিশেষত সেক্রেটারিয়েটের জন্য প্রয়োজন ছিল স্টাফদের কাজে অর্থপূর্ণভাবে এসব টেকনোলজি অন্তর্ভুক্ত করা। স্টাফদের উদ্ভাবন ও হাতিয়ারের জন্য জবাবদিহি একান্তভাবেই পরিমাপ করা যাবে না সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞার আওতায়। উদ্ভাবন পদ্ধতি অবশ্যই পরীক্ষা করতে সার্বিকভাবে, যা থেকে বেরিয়ে আসবে মূল্য ও ভেতরের বিষয়গুলো, যদি তারা কাঙ্ক্ষিত সফলতা না-ও পায়। পারস্পরিক শিক্ষা প্রক্রিয়ার ওপর সমভাবে নজর দিতে হবে সিনিয়র ও জুনিয়র পর্যায়ের স্টাফদের বেলায়।

জাতিসংঘ ব্যবস্থার ভেতরে বিদ্যমান পদক্ষেপের পরিস্থিতির পথ চিত্র তৈরি করা : আলোচ্য কৌশলপত্রে কিছু প্রস্তাবিত পর্যালোচনা ও মনিটিরিং মেকানিজম প্রশ্নে কিছু নির্দেশনা উল্লেখ করা হলেও এতে কম উল্লেখ রয়েছে কার্যকর হরাইজেন্টাল লার্নিং তথা ইনভূমক শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কাজের পরিমাণ সম্পর্কে। 'ইউএন ইনোভেশন নেটওয়ার্ক' বিভিন্ন এএফপির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পর্যালোচনা সরবরাহ করে, কিন্তু এটি কোনো ব্যাপকভিত্তিক রেকর্ড নয়। জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারিয়েট ও এএফপিগুলোর পরবর্তী জরুরি পদক্ষেপ হবে সবগুলো উপায়ের একটি বিস্তারিত পথচিত্র তথা ম্যাপ তৈরি করা, সেখানে তুলে ধরা হবে নয়া প্রযুক্তির কাজের নানা দিক– আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাজেরও। এসব রেকর্ড ও বিশ্লেষণ সামনে নিয়ে আসবে একটি মূল্যবান প্ল্যাটফরম, যার ওপর ভিত্তি করে নির্বাহী কমিটি ও প্রধান নির্বাহীদের কো-অর্ডিনেশন বোর্ড প্রস্তাব করবে তাদের সমন্বয় অনুশীলনসমূহ। অধিকন্তু, তারা আরো ভালোভাবে সহায়তা দেবে জাতিসঙ্ঘে শান্তি, নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও মানবাধিকার-সংক্রান্ত রিপোর্টিং জোরদার করার ব্যাপারে। মহাসচিবের অনুরোধের প্রতি।

জাতিসংঘ এর কাজ কীভাবে সম্পন্ন করবে, সে ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি হচ্ছে সক্ষমতা এনে দেয়ায় একটি শক্তিশালী সক্ষমতা দানের হাতিয়ার। জাতিসঙ্ঘের মহাসচিবের নয়া প্রযুক্তিবিষয়ক সম্মুখমুখী কৌশল জাতিসংঘকে আরো ভালো অবস্থানে নিয়ে দাঁড় করাবে। এ কাজে জাতিসংঘ সফল হতে পারবে কি পারবে না, তা নির্ভর করে জাতিসঙ্ঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর এই সংস্থাকে বিশ্বের জন্য কল্যাণমুখী করে তোলার ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছার মাত্রার ওপর কজ

ফিডব্যাক : golapmunir@yahoo.com